OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 49
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 421 - 434
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iv, Published on October issue 2026, Page No. 421 - 434
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে আরবি-ফারসি শব্দ ও সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গ : একটি ভাষাতাত্ত্বিক পাঠ

মো. নাইমুল হক
প্রভাষক, আরবি বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ
Email ID: naimulhoque@cu.ac.bd
0009-0004-4230-5176
এবং
মো. ওমর ফারুক
প্রভাষক, আরবি বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ
Email ID: omarfaruq@cu.ac.bd
0009-0006-3852-1110

Received Date *30. 09. 2026*
Selection Date *15. 10. 2026*

Keyword
Medieval Bengali Literature, Arabic-Persian Loanwords, Linguistic Adaptation, Cultural Connotations, Religious Terminology, Linguistic Hybridity, Muslim-Hindu Cultural Interaction, Semantic Fields, Linguistic Identity.

Abstract
Medieval Bengali literature, spanning the fourteenth to the eighteenth century, was far more than a mere repository of religious and romantic tales; it served as a dynamic site of linguistic and cultural integration. During this period, the influx of Arabic and Persian vocabulary did more than just expand the lexicon—it reflected the shifting religious, social, and cultural landscapes of Bengali Muslim society. This study investigates the linguistic and cultural significance of these Arabic-Persian elements within selected medieval texts, examining how they were morphologically adapted and utilized to express religious identity and cultural nuance. Using a historical-linguistic approach informed by sociolinguistic perspectives, the research analyzes the works of Shah Muhammad Sagir, Syed Sultan, Daulat Qazi, Alaol, Shah Garibullah, and Bharatchandra. The findings reveal that Arabic and Persian borrowings underwent profound transformations across four levels: phonological, orthographic, morphological, and semantic. These terms can be categorized into five primary domains: religious, socio-cultural, administrative-political, everyday, and literary-aesthetic vocabulary. The religious layer is especially prominent. In Syed Sultan's 'Nabivamsha', the parallel representation of Islamic and Hindu traditions serves as a testament to cultural coexistence. Meanwhile, in Shah Muhammad Sagir's 'Yusuf-Zulekha', Arabic and Persian words transcend simple utility, acting as vital tools for constructing poetic imagery and aesthetic symbolism. Furthermore, Shah Garibullah's 'Amir

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 49
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 421 - 434
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Hamza'—composed in Bengali but utilizing the Persian script—highlights the complex interplay between language and orthography in this era. Ultimately, this study reassesses the linguistic heritage of medieval Bengali literature. Rather than viewing Arabic and Persian elements as isolated foreign imports, this research frames them as organic, integrated components of the language. By doing so, it offers a more nuanced understanding of a medieval literary culture defined by multilingualism, complex adaptation, and a deeply pluralistic character.

Discussion

ভূমিকা : মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য কেবল ধর্মীয় আখ্যান বা প্রণয়কাহিনির সমষ্টি নয়; এটি ভাষিক সংযোগ, সাংস্কৃতিক সমন্বয় ও সাহিত্যিক অভিযোজনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের বিকাশে আরবি-ফারসি শব্দের উপস্থিতি কেবল শব্দভাণ্ডারের সম্প্রসারণ ঘটায়নি; বরং তা সমকালীন ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনেরও ভাষিক প্রতিফলন ঘটিয়েছে। বাংলায় মুসলিম শাসনের প্রতিষ্ঠা এবং প্রশাসন ও সংস্কৃতির ভাষা হিসেবে ফারসির বিস্তারের সঙ্গে বাংলা ভাষায় ফারসি এবং আরবি শব্দের প্রবেশও ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর যুগান্তকারী গবেষণায় দেখিয়েছেন যে তিনি 'the Persian element in Bengali' নিয়ে স্বতন্ত্র মনোগ্রাফ রচনা করেছিলেন— যা প্রমাণ করে ফারসি উপাদানের ভাষাতাত্ত্বিক গুরুত্ব তাঁর কাছে কতটা মৌলিক ছিল।[১] মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে আরবি-ফারসি উপাদান বিশেষত মুসলিম কবিদের রচনায় ধর্মীয় ধারণা, সামাজিক সম্পর্ক, প্রশাসনিক পরিভাষা এবং দৈনন্দিন জীবনের নানা অনুষঙ্গ প্রকাশের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে ওঠে। সৈয়দ আলী আশরাফ তাঁর 'Muslim Traditions in Bengali Literature'-এ লিখেছেন, 'It was only in the 19th century that this tradition decayed' — এই মন্তব্য ইঙ্গিত করে যে মধ্যযুগে আরবি-ফারসি উপাদান ছিল স্বাভাবিক ও জীবন্ত ঐতিহ্য।[২] ফলে আরবি-ফারসি শব্দের উপস্থিতিকে কেবল ভাষাগত ধার বা বিদেশি শব্দের সংযোজন হিসেবে দেখলে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যভাষার প্রকৃত বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য ও সমাজ-সংস্কৃতি নিয়ে আহমদ শরীফের গবেষণা এই সময়ের সাহিত্যিক পরিবেশ ও সামাজিক বাস্তবতা বোঝার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর 'Bangali O Bangla Sahitya' মধ্যযুগের সমাজ ও সংস্কৃতির বিভিন্ন স্তর উন্মোচন করেছে।[৩] তিনি সৈয়দ সুলতানের কাব্য সম্পাদনা করেছেন এবং পুঁথি সাহিত্যের ভাষিক বিশ্লেষণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। মুহম্মদ এনামুল হক ও সাহিত্যবিশারদ 'আরকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য' নামক গবেষণাগ্রন্থে আলাওলকে 'মহাকবি' আখ্যা দিয়েছেন।[৪] সৈয়দ আলী আশরাফের 'Muslim Traditions in Bengali Literature' মধ্যযুগীয় মুসলিম সাহিত্যের ধারাবাহিকতা ও ভাষা-নির্বাচনের রাজনীতি নিয়ে মৌলিক অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে। আয়েশা এ. ইরানি *Nabīvaṃśa*-কে বাংলায় ইসলামী আখ্যান নির্মাণের একটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন হিসেবে বিশ্লেষণ করেছেন এবং দেখিয়েছেন যে গ্রন্থটি ইসলামী সাহিত্যিক ঐতিহ্য ও বাংলা আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক পরিসরের আন্তঃসম্পর্কের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে।[৫] এই ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক প্রেক্ষাপটে আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহারকে কেবল শব্দভাণ্ডারের পরিবর্তন হিসেবে বিবেচনা করা যথেষ্ট নয়। এসব শব্দ বাংলা ভাষার ধ্বনি, রূপ ও বাক্যগঠনের সঙ্গে অভিযোজিত হয়ে সাহিত্যিক ব্যবহারে নতুন অর্থগত ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য অর্জন করেছে। ধর্মীয় পরিভাষার পাশাপাশি প্রেম, যুদ্ধ, প্রশাসন, সামাজিক সম্পর্ক, পোশাক, খাদ্য, জীবনযাপন ও আবেগ প্রকাশের ক্ষেত্রেও এধরনের শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ফলে আরবি-ফারসি শব্দের বিশ্লেষণ মধ্যযুগীয় বাংলার বহুভাষিক ও বহুসাংস্কৃতিক চরিত্র বোঝার একটি কার্যকর উপায়। তবে বিদ্যমান আলোচনার একটি উল্লেখযোগ্য অংশে আরবি-ফারসি শব্দের উপস্থিতি হয় আভিধানিক তালিকা, নয়তো ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রভাবের সাধারণ আলোচনায় সীমাবদ্ধ থাকে। শব্দের রূপতাত্ত্বিক অভিযোজন, সাহিত্যিক প্রয়োগ, অর্থগত সম্প্রসারণ এবং সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে পাঠ্যভিত্তিক পদ্ধতিগত বিশ্লেষণ তুলনামূলকভাবে কম। বিশেষত মুসলিম ও হিন্দু

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 49
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 421 - 434
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

কবিদের ভাষা-নির্বাচনের তুলনা এবং আরবি-ফারসি শব্দের সাহিত্যিক কার্যকারিতা আরও নিবিড়ভাবে পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হল মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের নির্বাচিত পাঠ্যে আরবি-ফারসি শব্দের উপস্থিতি, রূপতাত্ত্বিক অভিযোজন এবং সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক ব্যবহার বিশ্লেষণ করা। শাহ মুহম্মদ সগীর, সৈয়দ সুলতান, দৌলত কাজী, আলাওল, শাহ গরীবুল্লাহ এবং ভারতচন্দ্রের নির্বাচিত রচনায় ব্যবহৃত শব্দসম্ভার পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে কোন শব্দগোষ্ঠী অধিক ব্যবহৃত হয়েছে, কীভাবে সেগুলো বাংলা ভাষার কাঠামোর সঙ্গে অভিযোজিত হয়েছে এবং কী ধরনের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গ সৃষ্টি করেছে— তা অনুসন্ধান করা হবে। পাশাপাশি মুসলিম ও হিন্দু কবিদের ভাষা-নির্বাচনের তুলনামূলক পাঠের মাধ্যমে আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহারের প্রকৃতি ও প্রেক্ষাপট নির্ণয়ের চেষ্টা করা হবে।

গবেষণাটি ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান, সমাজভাষাবিজ্ঞান ও তুলনামূলক সাহিত্যপাঠের সমন্বিত পদ্ধতি অনুসরণ করবে। শব্দের উৎস, রূপগত পরিবর্তন, ব্যবহারিক প্রেক্ষাপট এবং সাহিত্যিক তাৎপর্য বিশ্লেষণের পাশাপাশি নির্বাচিত পাঠ্যের নির্ভরযোগ্য সংস্করণ ব্যবহার করা হবে। এর মাধ্যমে আরবি-ফারসি শব্দকে বিচ্ছিন্ন ভাষিক আমদানি হিসেবে নয়, বরং মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যভাষার বিকাশে সক্রিয় ও অভিযোজিত উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গি মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের ভাষিক বহুত্ব, সাংস্কৃতিক আন্তঃসম্পর্ক এবং সাহিত্যিক সৃজনশীলতার একটি সংক্ষিপ্ত ও সুসংবদ্ধ চিত্র নির্মাণে সহায়তা করবে।

প্রথম পর্ব : ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, আরবি-ফারসি ঋণশব্দের আগমন এবং ভাষিক অভিযোজন—

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট : বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনা ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তুর্কি বিজয়ের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এই রাজনৈতিক পরিবর্তন কেবল শাসনব্যবস্থার রূপান্তর ঘটায়নি; বরং ভাষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক সুদূরপ্রসারী প্রভাব সৃষ্টি করেছে। শাহ মুহম্মদ সগীরের *ইউসুফ-জুলেখা* গিয়াসউদ্দীন আজম শাহের শাসনামলের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং বাংলা সাহিত্যে প্রাচীন মুসলিম প্রণয়োপাখ্যানের একটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন।[৬] এই তথ্য প্রমাণ করে যে চতুর্দশ শতকের শেষভাগেই বাংলা ভাষায় মুসলিম কবিরা ধর্মীয় আখ্যান রচনায় সক্রিয় ছিলেন। সৈয়দ আলী আশরাফ তাঁর 'Muslim Traditions in Bengali Literature'-এ মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের তিনটি প্রধান ধারা চিহ্নিত করেছেন- বৌদ্ধ, হিন্দু ও মুসলিম।[৭] এই শ্রেণিবিন্যাস ভাষিক ও সাংস্কৃতিক স্তরবিন্যাসের এক গুরুত্বপূর্ণ সূচক।

মুসলিম শাসকদের ভাষা-নীতি সম্পর্কে একটি তাৎপর্যপূর্ণ প্রমাণ সৈয়দ সুলতানের *নবীবংশ* কাব্যের ভূমিকায় পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন—

"আরবী ফারসী ভাষে কিতাব বহুত।
আলিমানে বুঝে ন বুঝে মুখসুত॥
দুঃখ ভাবি মনে মনে করিলুং ঠিক।
রছুলের কথা যথ কহিমু অধিক॥"[৮]

এই পদ্যটি একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশ করে। প্রথমত, তৎকালীন বাংলায় আরবি ও ফারসি ভাষায় প্রচুর গ্রন্থ বিদ্যমান ছিল। দ্বিতীয়ত, কেবল আলিম বা পণ্ডিতশ্রেণিই সেই গ্রন্থগুলো বুঝতে পারতেন, সাধারণ মানুষ নয়। তৃতীয়ত, কবি সচেতনভাবে বাংলা ভাষায় রসুলের কথা বর্ণনার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সৈয়দ সুলতানের *নবীবংশ (Nabīvaṃśa)* বাংলায় ইসলামী ধর্মতত্ত্ব ও নবী-আখ্যান উপস্থাপনের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক নিদর্শন।[৯] এই সিদ্ধান্ত ভাষিক আত্মপরিচয়ের এক গুরুত্বপূর্ণ মোড় হিসেবে বিবেচ্য।

বাংলায় আরবি-ফারসি শব্দের অনুপ্রবেশের প্রক্রিয়া : আরবি-ফারসি শব্দের অনুপ্রবেশ কোনো এককালীন ঘটনা নয়; এটি এক বহুস্তরীয় ও দীর্ঘস্থায়ী প্রক্রিয়া। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'The Origin and Development of the Bengali Language'-এ উল্লেখ করেছেন যে, প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ ছাত্রবৃত্তির অধীনে তাঁর তিন বছরের গবেষণা-কার্যক্রমের মধ্যে একটি

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 49
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 421 - 434
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

মনোগ্রাফ ছিল 'the Persian element in Bengali'।[১০] এই তথ্যটি প্রমাণ করে যে ফারসি উপাদানের ভাষাতাত্ত্বিক গুরুত্ব বাংলা ভাষার ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানে বহুদিন ধরেই স্বীকৃত।

আরবি-ফারসি শব্দের অনুপ্রবেশের প্রধান কারণগুলো নিম্নরূপ—

প্রথমত, ধর্মীয় কারণ। ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আরবি ধর্মীয় পরিভাষা বাংলায় প্রবেশ করে। *নবীবংশ*-এর মতো কাব্যে 'আল্লাহ', 'রসুল', 'নবী', 'কুরআন', 'নামাজ', 'রোজা', 'জান্নাত', 'দোজখ' ইত্যাদি শব্দের ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

দ্বিতীয়ত, প্রশাসনিক কারণ। মুসলিম শাসনব্যবস্থার প্রতিষ্ঠার ফলে ফারসি ভাষা রাজদরবার, প্রশাসন ও বিচারব্যবস্থার ভাষা হয়ে ওঠে। ফলে 'বাদশা', 'উজির', 'কাজি', 'দিওয়ান', 'ফরমান', 'সুলতান' ইত্যাদি শব্দ বাংলায় প্রবেশ করে।

তৃতীয়ত, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক কারণ। ফারসি সাহিত্যের প্রেমকাহিনি, রূপকথা ও নীতিকথা বাংলায় অনূদিত হওয়ার ফলে বিপুল সংখ্যক ফারসি শব্দ বাংলা সাহিত্যে প্রবেশ করে। আলাওলের *পদ্মাবতী, সয়ফুলমূলক বদিউজ্জামাল* প্রভৃতি কাব্যে এই প্রবণতা সুস্পষ্ট।

চতুর্থত, দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কারণ। মুসলিম সমাজের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় শব্দ— যেমন 'খোদা', 'বন্দা', 'মেহমান', 'খেদমত', 'সালাম', 'দোয়া' — স্বাভাবিকভাবে বাংলা ভাষায় স্থান করে নেয়।

ধ্বনিতাত্ত্বিক অভিযোজন : আরবি-ফারসি শব্দ বাংলায় প্রবেশের সময় ধ্বনিতাত্ত্বিক অভিযোজনের মধ্য দিয়ে যায়। কারণ আরবি ও ফারসির ধ্বনিব্যবস্থা বাংলার ধ্বনিব্যবস্থা থেকে মৌলিকভাবে ভিন্ন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বিশ্লেষণ অনুসারে, এই অভিযোজনের কয়েকটি প্রধান প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।[১১]

প্রথমত, আরবি-ফারসির বিদেশি ধ্বনি বাংলায় উপস্থিত ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়। যেমন আরবি 'খ' ধ্বনি বাংলায় সাধারণত 'খ' হিসেবেই থাকে, কিন্তু আরবি 'হা' কখনও 'হ' হয়ে যায়। ফারসি 'প' ধ্বনি বাংলায় 'প' হিসেবেই থাকে, কিন্তু আরবি 'ফ' বাংলায় 'ফ' বা 'প' উভয়ভাবেই উচ্চারিত হতে পারে।

দ্বিতীয়ত, শব্দের আদিতে সংযুক্ত ব্যঞ্জনগুচ্ছ বাংলায় সরলীকৃত হয়। যেমন ফারসি 'ইশক' বাংলায় 'ইশক' বা 'ইসক' হয়ে যায়।

তৃতীয়ত, শব্দের অন্তে হ্রস্ব স্বর যোগ বা বিলোপ ঘটে। যেমন আরবি 'হক' বাংলায় 'হক' হিসেবেই থাকে, কিন্তু আরবি 'কিতাব' বাংলায় 'কিতাব' হিসেবেই ব্যবহৃত হয়।

শাহ মুহম্মদ সগীরের সঙ্গে চট্টগ্রামের সম্পর্ক নিয়ে গবেষণায় মতভেদ থাকলেও তাঁর *ইউসুফ-জুলেখা*-র পাণ্ডুলিপি চট্টগ্রাম-কমিল্লা-ত্রিপুরা অঞ্চলে পাওয়া যাওয়ার কারণে তাঁকে পূর্ববঙ্গের সঙ্গে সম্পর্কিত করার একটি প্রবল মত রয়েছে।[১২] এই তথ্য প্রমাণ করে যে ধ্বনিতাত্ত্বিক অভিযোজন কেবল কেন্দ্রীয় বাংলা ভাষায় সীমাবদ্ধ ছিল না; আঞ্চলিক ভাষাগুলোতেও স্বতন্ত্র অভিযোজন ঘটেছিল।

লিপিতাত্ত্বিক অভিযোজন : আরবি-ফারসি শব্দ বাংলা লিপিতে লিখিত হওয়ার সময় লিপিতাত্ত্বিক অভিযোজনের মধ্য দিয়ে যায়। আরবি ও ফারসি লিপি ডান থেকে বামে লিখিত হয় এবং তাতে হরফের অবস্থান অনুসারে রূপ পরিবর্তিত হয়। কিন্তু বাংলা লিপি বাম থেকে ডানে লিখিত এবং হরফের রূপ তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল।

আরবি-ফারসি শব্দ বাংলা লিপিতে লেখার সময় কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়—

প্রথমত, আরবি-ফারসি লিপিতে বিদ্যমান কিন্তু বাংলা লিপিতে অনুপস্থিত ধ্বনির জন্য নিকটতম বাংলা বর্ণ ব্যবহৃত হয়। যেমন আরবি 'কাফ' বাংলায় সাধারণত 'ক' হিসেবেই লেখা হয়।

দ্বিতীয়ত, আরবি-ফারসি শব্দে বিদ্যমান 'ইজাফত' বা 'তৎপুরুষ' সমাস বাংলা লিপিতে লেখার সময় সরলীকৃত হয়।

তৃতীয়ত, শব্দের মূল আরবি-ফারসি বানান বাংলা লিপিতে উচ্চারণ-অনুসারী হয়। অর্থাৎ বাংলা লিপিতে লেখার সময় শব্দের উচ্চারণই প্রধান বিবেচনা, মূল বানান নয়।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 49
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 421 - 434
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এই লিপিতাত্ত্বিক অভিযোজনের একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হল ফারসি হরফে বাংলা ভাষায় রচিত পুঁথি সাহিত্য। শাহ গরীবুল্লাহর *আমির হামজা* ফারসি হরফে লিখিত হলেও তার ভাষা বাংলা। এই ঘটনা ভাষা-লিপি সম্পর্কের এক জটিল দ্বান্দ্বিকতা প্রকাশ করে, যা পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচিত হবে।

রূপতাত্ত্বিক অভিযোজন : আরবি-ফারসি শব্দ বাংলায় প্রবেশের পর বাংলা রূপতত্ত্বের নিয়মে অভিযোজিত হয়। এই অভিযোজন কয়েকটি স্তরে ঘটে —

প্রথমত, আরবি-ফারসি শব্দে বাংলা উপসর্গ যোগ করা হয়। যেমন- 'খেদমত' থেকে 'খেদমতগার', 'দোয়া' থেকে 'দোয়াদরুদ', 'সালাম' থেকে 'সালামী' ইত্যাদি।

দ্বিতীয়ত, আরবি-ফারসি শব্দে বাংলা প্রত্যয় যোগ করা হয়। যেমন- 'বাদশা' থেকে 'বাদশাহী', 'উজির' থেকে 'উজিরী', 'কাজি' থেকে 'কাজিয়ানা' ইত্যাদি।

তৃতীয়ত, আরবি-ফারসি শব্দ বাংলা ক্রিয়াপদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যৌগিক ক্রিয়া গঠন করে। যেমন- 'সালাম করা', 'দোয়া করা', 'খেদমত করা', 'কবুল করা' ইত্যাদি।

চতুর্থত, আরবি-ফারসি শব্দ বাংলা সমাসে অংশগ্রহণ করে। যেমন - 'বাদশা-বেগম', 'খোদা-হাফেজ', 'হুকুম-নামা' ইত্যাদি। সৈয়দ সুলতানের *নবীবংশ*-এ এই রূপতাত্ত্বিক অভিযোজনের বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কবি 'আল্লাহু ইলিব তোরা আলিম আলিলা' পদ্যে আরবি শব্দ 'আল্লাহু' এবং 'আলিম'-কে বাংলা বাক্যগঠনের সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন।

আর্থিক অভিযোজন ও আর্থিক পরিবর্তন : আরবি-ফারসি শব্দ বাংলায় প্রবেশের সময় কেবল রূপগত নয়, অর্থগত অভিযোজনও ঘটে। কয়েকটি প্রধান প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় -

প্রথমত, আরবি-ফারসি শব্দের মূল অর্থ সংকুচিত বা প্রসারিত হয়। যেমন আরবি 'হক' শব্দের মূল অর্থ 'সত্য' বা 'ন্যায্য অধিকার'; বাংলায় এটি 'হক' হিসেবেই ব্যবহৃত হয়, তবে কখনও 'প্রাপ্য' বা 'অধিকার' অর্থেও।

দ্বিতীয়ত, কিছু শব্দের ধর্মীয় অর্থ প্রাধান্য লাভ করে। যেমন - ফারসি 'দিল' শব্দটি বাংলায় প্রেম-সংক্রান্ত প্রসঙ্গে বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়।

তৃতীয়ত, কিছু শব্দ বাংলায় এসে নতুন সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গ অর্জন করে। যেমন 'মেহমান' শব্দটি ফারসি 'মিহমান' থেকে এসেছে; বাংলায় এটি আতিথেয়তার সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের বাহক হয়ে ওঠে।

চতুর্থত, কিছু আরবি-ফারসি শব্দ বাংলায় এসে স্থানীয় শব্দের সঙ্গে সমার্থক জোড়া গঠন করে। যেমন - 'আল্লাহ-খোদা', 'রসুল-নবী', 'দোয়া-প্রার্থনা'।

প্রামাণ্য দৃষ্টান্ত : মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য থেকে -

দৃষ্টান্ত ১ : আলাওলের 'হামদ' -

আলাওল তাঁর কাব্যের সূচনায় লিখেছেন -

> "বিছমিল্লাহ প্রভুর নাম আরম্ভ প্রথম।
> অদ্যমূলশীর সেই সোভিত উত্তম॥"[১৩]

এখানে 'বিছমিল্লাহ' আরবি শব্দ, যা ইসলামি পরিভাষায় বিশেষ ধর্মীয় তাৎপর্য বহন করে। কবি এই আরবি শব্দটি বাংলা বাক্যের শুরুতে স্থাপন করেছেন, যা রূপতাত্ত্বিক ও আর্থিক উভয় দিক থেকেই অভিযোজনের সাক্ষ্য দেয়। 'বিছমিল্লাহ' শব্দটি বাংলায় এসে কেবল ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের শব্দ হিসেবে নয়, বরং সাহিত্যিক সূচনার একটি রীতিগত অঙ্গ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

দৃষ্টান্ত ২ : সৈয়দ সুলতানের 'নবীবংশ' -

সৈয়দ সুলতানের *নবীবংশ*-এর ভাষায় ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক উভয় স্তরের আরবি-ফারসি শব্দের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়-

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 49
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 421 - 434
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

"এবং শুন যেক্ষপ জিন্মব মুহম্মদ।
শুনিলে সে সব কথা খণ্ডি আপদ॥"[১৪]

এখানে 'মুহম্মদ' আরবি শব্দ, 'জিন্মব' সম্ভবত 'জন্ম' বা 'জিনিস'-এর আঞ্চলিক রূপ। এই পদ্যে আরবি শব্দ বাংলা বাক্যের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে মিশে গেছে।

দৃষ্টান্ত ৩ : শাহ মুহম্মদ সগীরের 'ইউসুফ-জুলেখা' - শাহ মুহম্মদ সগীরের কাব্য সম্পর্কে আহমদ শরীফ লিখেছেন যে তিনি পবিত্র কুরআন ও ফিরদৌসীর কাব্য ব্যতীত মুসলিম কিংবদন্তী ও স্বীয় সৃজনী প্রতিভায় নির্ভর করিয়াই *ইউসুফ-জুলেখা* রচনা করিয়াছিলেন।[১৫] এই কাব্যে 'ইউসুফ', 'জুলেখা', 'মিসর', 'আজিজ' ইত্যাদি আরবি শব্দের ব্যবহার ধর্মীয় আখ্যানের ভাষিক ভিত্তি নির্মাণ করে। কিন্তু এসব শব্দ কেবল আভিধানিক নয়; এগুলো কাহিনির চরিত্র ও স্থানের পরিচয়বাহী সাংস্কৃতিক চিহ্নও বটে।

প্রথম পর্বের সারসংক্ষেপ : মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে আরবি-ফারসি শব্দের অনুপ্রবেশ ধর্মীয়, প্রশাসনিক, সাংস্কৃতিক ও দৈনন্দিন— এই চারটি প্রধান কারণের সমন্বিত ফল। এই শব্দগুলো ধ্বনিতাত্ত্বিক, লিপিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক ও আর্থিক— এই চার স্তরে বাংলা ভাষার নিয়মে অভিযোজিত হয়েছে। শাহ মুহম্মদ সগীর, সৈয়দ সুলতান, আলাওল প্রমুখ কবিদের কাব্যে এই অভিযোজনের প্রামাণ্য দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। এই প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ প্রমাণ করে যে মধ্যযুগীয় বাংলা ভাষায় আরবি-ফারসি উপাদান কেবল বাহ্যিক আমদানি ছিল না; বরং তা বাংলা ভাষার স্বাভাবিক অভিব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছিল। পরবর্তী পর্বে এই শব্দগুলোর সাহিত্যিক ব্যবহার ও সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গের বিশ্লেষণ উপস্থাপিত হবে।

দ্বিতীয় পর্ব: অর্থক্ষেত্রভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস ও সাহিত্যিক প্রয়োগের বিশ্লেষণ—

ধর্মীয় শব্দভাণ্ডার : ইসলামি বিশ্বাসের ভাষিক ভিত্তি— ধর্মীয় শব্দভাণ্ডার মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে আরবি-ফারসি ঋণশব্দের কেন্দ্রীয় স্তর গঠন করে। এই শব্দস্তরের উৎপত্তি সরাসরি বাংলায় ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসারের সঙ্গে সম্পর্কিত। 'আল্লাহ', 'রসুল', 'নবী', 'কুরআন', 'নামাজ', 'রোজা', 'জান্নাত', 'দোজখ', 'তওবা', 'ইবাদত' প্রভৃতি শব্দ ইসলামি বিশ্বাসব্যবস্থার অপরিহার্য অভিব্যক্তিরূপে বাংলা ভাষায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সৈয়দ সুলতানের *নবীবংশ*-এর সূচনা-পর্বে ধর্মীয় শব্দের ব্যবহার পদ্ধতিগত স্তরে পৌঁছেছে। কবি ঘোষণা করেছেন—

"আল্লাহু ইলিব তোরা আলিম আলিলা।
আল্লাহ ছাড়া উপাস্য নাই ইহা সবে বলা॥"[১৬]

এই পদ্যে 'আল্লাহু' আরবি শব্দ এবং 'আলিম' আরবি 'আলিম' (জ্ঞানী) শব্দ বাংলা বাক্যগঠনে সংযুক্ত হয়েছে। লক্ষণীয় যে, কবি আরবি 'আল্লাহু' শব্দের শেষের 'উ' ধ্বনি অক্ষুণ্ন রেখেছেন, যা ধর্মীয় পরিভাষায় মূল উচ্চারণের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করে। আরও তাৎপর্যপূর্ণ হল সৈয়দ সুলতানের ভাষা-নির্বাচনের স্বঘোষিত যুক্তি। তিনি লিখেছেন—

"আরবী ফারসী ভাষে কিতাব বহুত।
আলিমানে বুঝে ন বুঝে মুখসুত॥
দুঃখ ভাবি মনে মনে করিলুং ঠিক।
রছুলের কথা যথ কহিমু অধিক॥"[১৭]

এই পদ্যের বিশ্লেষণে কয়েকটি স্তর চিহ্নিত করা যায়। প্রথমত, 'কিতাব' (আরবি কিতাব) এবং 'আলিম' (আরবি আলিম) শব্দ দুটি ধর্মীয় জ্ঞানের পরিভাষা। দ্বিতীয়ত, 'মুখসুত' শব্দটি আরবি 'মাখসুদ' (উদ্দেশ্য) শব্দের বাংলা ধ্বনিতাত্ত্বিক রূপান্তর। তৃতীয়ত, 'রছুল' শব্দটি আরবি 'রাসুল' শব্দের আঞ্চলিক উচ্চারণ-রূপ, যেখানে 'স' ধ্বনি 'ছ' হয়ে গেছে। এই রূপান্তর চট্টগ্রাম অঞ্চলের উপভাষার বৈশিষ্ট্য, যা প্রমাণ করে যে ধর্মীয় শব্দও আঞ্চলিক ধ্বনিতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গেছে।[১৮]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 49
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 421 - 434
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সৈয়দ সুলতানের মতে, আরবি ও ফারসি ভাষায় প্রচুর গ্রন্থ বিদ্যমান ছিল, কিন্তু কেবল আলিমগণ তা বুঝতেন; সাধারণ মানুষ বুঝত না। এই বাস্তবতা থেকেই বাংলা ভাষায় ধর্মীয় আখ্যান রচনার প্রয়োজনীয়তা জন্ম নেয়। ধর্মীয় শব্দের বাংলায় অনুপ্রবেশ তাই কেবল আভিধানিক ঘটনা নয়; এটি ধর্মীয় জ্ঞানের গণতন্ত্রীকরণের ভাষিক প্রতিফলন।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক শব্দভাণ্ডার : দৈনন্দিন জীবনের ভাষিক সমন্বয়— সামাজিক ও সাংস্কৃতিক শব্দভাণ্ডার আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক, সামাজিক আচার, রীতিনীতি ও জীবনযাত্রার উপকরণকে অন্তর্ভুক্ত করে। এই ক্ষেত্রের আরবি-ফারসি শব্দের অনুপ্রবেশ ধর্মীয় কারণে নয়, বরং বাস্তব যোগাযোগের প্রয়োজন থেকে ঘটেছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এর ভাষায়ও আরবি-ফারসি উৎসজাত কিছু শব্দের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়; এধরনের শব্দ মধ্যযুগীয় বাংলার বহুভাষিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগের ভাষিক সাক্ষ্য বহন করে।[১৯] ‘কামান’ (ফারসি কামান, ধনুক) শব্দটি কৃষ্ণের ভ্রূ-বর্ণনায় ব্যবহৃত হয়েছে ভ্রূকে ধনুকের সঙ্গে তুলনা করে। এটি একটি বিশুদ্ধ অলংকারিক প্রয়োগ, যার সঙ্গে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। ফারসি ‘ধনুক’ শব্দটি বাংলা কাব্যের সৌন্দর্য-বর্ণনার মানক উপমায় পরিণত হয়েছে। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে আরবি-ফারসি শব্দ বাংলা সাহিত্যিক চেতনার অবচেতন স্তরে প্রবেশ করেছে।

‘বাকি’ (আরবি বাকি, অবশিষ্ট), ‘মজুরি’ (আরবি উজরাত থেকে ফারসি মজদুরি, মজুরি), ‘লেবু’ (আরবি লাইমুন) প্রভৃতি শব্দ *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এ দৈনন্দিন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।[২০] এই শব্দগুলো কোনো ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক বিশেষত্ব বহন করে না; এগুলো নিছক ব্যবহারিক অভিব্যক্তি।

সামাজিক শব্দভাণ্ডারের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণি হলো সম্ভাষণ ও শিষ্টাচারের শব্দ। ‘সালাম’, ‘দোয়া’, ‘মেহমান’, ‘খেদমত’, ‘হুজুর’ প্রভৃতি শব্দ মুসলিম সমাজের দৈনন্দিন যোগাযোগের অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে ওঠে। শাহ মুহম্মদ সগীরের *ইউসুফ-জুলেখা*-য় ‘সালাম’ শব্দটি সম্ভাষণ-অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।[২১] এই ব্যবহার প্রমাণ করে যে সম্ভাষণ-পদ্ধতিও ভাষার সঙ্গে সঙ্গে অভিযোজিত হয়েছে।

প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক শব্দভাণ্ডার : ক্ষমতার ভাষিক চিহ্ন— প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক শব্দভাণ্ডার সরাসরি মুসলিম শাসনব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত। ‘বাদশা’, ‘উজির’, ‘কাজি’, ‘দিওয়ান’, ‘ফরমান’, ‘সুলতান’, ‘সুবাদার’, ‘মোক্তার’, ‘আমিল’ প্রভৃতি শব্দ প্রশাসনিক ক্ষমতার ভাষিক কাঠামো নির্মাণ করে।

শাহ মুহম্মদ সগীরের *ইউসুফ-জুলেখা*-য় রাজসভার বর্ণনায় এই শব্দগুলোর প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।[২২] কবি মিসরের রাজা ‘আজিজ’-এর সভার বর্ণনায় ‘উজির’, ‘দিওয়ান’, ‘হাজির’ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেছেন। ‘আজিজ’ আরবি শব্দ, যার মূল অর্থ ‘শক্তিশালী’; কুরআনি আখ্যানে এটি মিসরের উচ্চপদস্থ কর্মচারীর উপাধি। বাংলা কাব্যে ‘আজিজ’ চরিত্রটি রাজপ্রতিনিধি বা মন্ত্রীর ভূমিকায় আবির্ভূত হয়।

প্রশাসনিক শব্দের একটি বিশেষ দিক হল দ্বৈত-অর্থবহতা। ‘কাজি’ শব্দটি একই সঙ্গে বিচারক এবং ধর্মীয় কর্তৃত্ব—উভয় অর্থ বহন করে। ইসলামি সমাজে বিচারব্যবস্থা ধর্মীয় আইনের ভিত্তিতে পরিচালিত হওয়ায় এই দ্বৈততা স্বাভাবিক। বাংলা সাহিত্যে ‘কাজি’ শব্দটি যে প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয়, তা সেই প্রসঙ্গের ধর্মীয় বা প্রশাসনিক প্রকৃতি নির্দেশ করে।

দৈনন্দিন জীবনের শব্দভাণ্ডার : ভাষা-সংযোগের গভীরতম স্তর : দৈনন্দিন জীবনের শব্দভাণ্ডার ভাষা-সংযোগের গভীরতম স্তর প্রকাশ করে। এই স্তরের শব্দগুলো ধর্মীয় বা প্রশাসনিক বিশেষত্ব বহন করে না; এগুলো খাদ্য, পোশাক, গৃহসজ্জা, রোগ-ব্যাধি, প্রাকৃতিক বস্তু প্রভৃতির সাধারণ অভিব্যক্তি।

সৈয়দ সুলতানের *নবীবংশ*-এ খাদ্যদ্রব্যের তালিকায় ‘চিনি’, ‘আঙুর’, ‘খোরমা’, ‘মধু’, ‘দধি’, ‘ঘৃত’ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।[২৩] এগুলোর মধ্যে ‘চিনি’ (ফারসি শকর, আরবি সুক্কার থেকে), ‘আঙুর’ (ফারসি আঙুর), ‘খোরমা’ (আরবি খুরমা) আরবি-ফারসি উৎসের। এই খাদ্যশব্দগুলোর বাংলায় অনুপ্রবেশ খাদ্য-সংস্কৃতির সংযোগের সাক্ষ্য দেয়।

ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে ‘চিনি’ শব্দটির যাত্রাপথ বিশেষভাবে তাৎপর্যবহ। সংস্কৃত ‘শর্করা’ থেকে প্রাকৃত ‘সক্করা’, thence আরবি ‘সুক্কার’, thence ফারসি ‘শকর’, thence বাংলা ‘চিনি’।[২৪] এই বহুস্তরীয় যাত্রাপথ প্রমাণ করে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 49
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 421 - 434
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

যে আরবি-ফারসি শব্দের অনুপ্রবেশ কোনো সরল দ্বিমুখী প্রক্রিয়া নয়; এটি ইউরেশীয় ভাষা-নেটওয়ার্কের জটিল আন্তঃক্রিয়ার ফল।

সাহিত্যিক ও নান্দনিক শব্দভাণ্ডার: কাব্যিক অভিব্যক্তির প্রসার : সাহিত্যিক ও নান্দনিক শব্দভাণ্ডার উপমা, অলংকার, রস ও কাব্যিক বিচারের পরিভাষা অন্তর্ভুক্ত করে। এই ক্ষেত্রের আরবি-ফারসি ঋণশব্দ সবচেয়ে সৃজনশীল, কারণ এগুলো বাংলা সাহিত্যের আত্ম-প্রতিফলনের স্তরে প্রবেশ করেছে।

আলাওলের *পদ্মাবতী*-য় কবি নিজের রচনা-প্রক্রিয়া সম্পর্কে লিখেছেন—

"না কহিলে দোষ হয় কহিতে উতরা।
এতেকে সজ্জন সবে জানা উচিত ধারা॥
বিচারিয়া যদি দোষ পাই নিজ চিতে।
লিখন শোধন করি না কহি পণ্ডিতে॥"[২৫]

এই পদ্যে কবিতাতত্ত্ব-সংক্রান্ত আলোচনা সম্পূর্ণ দেশীয় শব্দে সম্পন্ন হয়েছে; আরবি-ফারসি ঋণশব্দের উপস্থিতি নগণ্য। কিন্তু যখন আলাওল পদ্মাবতীর সৌন্দর্য বর্ণনা করেন, তখন আরবি-ফারসি নান্দনিক শব্দ আবির্ভূত হয়। এই ভাষা-স্তরের বিভাজন তাৎপর্যবহ: কবিতাতত্ত্বের ভাষা দেশীয়, কিন্তু সৌন্দর্য-বর্ণনার ভাষা আরবি-ফারসি শব্দসমৃদ্ধ।

আরবি-ফারসি নান্দনিক শব্দের মধ্যে 'দিল' (হৃদয়), 'ইশক' (প্রেম), 'জলওয়া' (দীপ্তি), 'হুসন' (সৌন্দর্য), 'নাজ' (অভিমান) প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ফারসি 'ইশক' শব্দটি বাংলায় প্রবেশের পর দেশীয় 'প্রেম' ও 'অনুরাগ' শব্দের সঙ্গে আংশিক অর্থগত সাদৃশ্য গড়ে তোলে; তবে এটি সম্পূর্ণ সমার্থক হয়ে ওঠে না।

'ইশক' তীব্রতা ও যন্ত্রণার দিকটি বেশি প্রকাশ করে, যেখানে 'প্রেম' আধ্যাত্মিকতার দিকে ঝুঁকে থাকে। এই সূক্ষ্ম অর্থ-পার্থক্য বাংলা ভাষায় প্রেম-অভিব্যক্তির পরিসর প্রসারিত করেছে।

অর্থ-প্রসার ও অর্থ-সংকোচ : ঋণশব্দের আর্থিক বিবর্তন : আরবি-ফারসি শব্দ বাংলায় প্রবেশের পর অর্থগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে। অর্থ-প্রসার ও অর্থ-সংকোচ এই পরিবর্তনের দুটি প্রধান অভিমুখ।

অর্থ-প্রসারের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো 'দোস্ত' (ফারসি : দোস্ত; অর্থ : বন্ধু)। ফারসিতে 'দোস্ত' কেবল 'বন্ধু' অর্থে ব্যবহৃত হয়। বাংলায় এসে এই শব্দ 'সঙ্গী', 'সহচর', 'সমর্থক' প্রভৃতি অর্থে প্রসারিত হয়েছে। অর্থ-প্রসার সাধারণত লক্ষ্য-ভাষায় অর্থগত শূন্যতার কারণে ঘটে।

'কাজি' শব্দটি আরবি *qāḍī* থেকে ফারসি *qāzī* হয়ে বাংলায় গৃহীত হয়েছে। বাংলা ব্যবহারে শব্দটি ইসলামি আইনের বিচারক এবং মুসলিম বিবাহ-নিবন্ধকের অর্থে ব্যবহৃত হয়।[২৬] এই প্রতিযোগিতায় ঋণশব্দের পরাজয় ঘটেছে।

প্রসঙ্গ-ভিত্তিক রূপান্তর ও সাহিত্যিক প্রয়োগ : আরবি-ফারসি শব্দের সাহিত্যিক প্রয়োগ প্রসঙ্গ-ভেদে ভিন্ন। ধর্মীয় পাঠ্যে এই শব্দগুলো ধর্মীয় তাৎপর্য বহন করে; ধর্মনিরপেক্ষ পাঠ্যে এগুলো নান্দনিক ও অলংকারিক ভূমিকা পালন করে। এই কার্য-বিভাজন ভাষা-সংযোগের পরিণত স্তরের সূচক।

সৈয়দ সুলতানের *নবীবংশ*-এ একটি বর্ণনা বিশেষভাবে বিশ্লেষণযোগ্য। তিনি মহানবীর বিবাহ-অনুষ্ঠানের বর্ণনায় লিখেছেন—

"চিত্র বিছানা পাড়ি দিল থানে থানে।
মাণিক্য মণ্ডিত ঘর চাঁদোয়া খাটানে॥
চিনি গুড় আঙুর খোরমা দুধ দধি ঘৃত।
ছাগল মেষ ভেড়া উট কত অগণিত॥"[২৭]

এই পদ্যে 'চিনি', 'গুড়', 'আঙুর', 'খোরমা' প্রভৃতি আরবি-ফারসি খাদ্যশব্দ 'মাণিক্য', 'চাঁদোয়া' প্রভৃতি দেশীয়/ সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে সমান্তরালে ব্যবহৃত হয়েছে। এই ভাষা-মিশ্রণ এক স্বতন্ত্র সাহিত্যিক প্রভাব সৃষ্টি করে— ধর্মীয় আখ্যানের মর্যাদা

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 49
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 421 - 434
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

রক্ষিত হয়, অথচ বর্ণনায় বাংলার দেশীয় বস্তুজগতের স্পর্শ থাকে। সৈয়দ সুলতান নিজেই তাঁর ভাষা-নির্বাচনের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেছেন—

"বাংলা ভাষা লিখি যদি নিন্দে কোন জন।
বাংলা ভাষা জন্ম নিন্দা সেই জনার মন॥"[২৮]

এই পদ্য ভাষা-আত্মপরিচয়ের এক ঐতিহাসিক ঘোষণা। ষোড়শ শতকের শেষভাগে একজন মুসলিম কবি বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষায় এই উচ্চারণ করেন। আরবি-ফারসি শব্দ তখন আর বহিরাগত উপাদান নয়; সেগুলো বাংলা ভাষার সাহিত্যিক অভিব্যক্তির অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে।

দ্বিতীয় পর্বের সারসংক্ষেপ : আরবি-ফারসি ঋণশব্দ মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে পাঁচটি প্রধান অর্থক্ষেত্রে বিস্তৃত - ধর্মীয়, সামাজিক-সাংস্কৃতিক, প্রশাসনিক-রাজনৈতিক, দৈনন্দিন ও সাহিত্যিক-নান্দনিক। ধর্মীয় শব্দভাণ্ডার ঋণশব্দের একটি কেন্দ্রীয় স্তর, যা ইসলামি বিশ্বাসের অভিব্যক্তির অপরিহার্য মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। সামাজিক ও দৈনন্দিন শব্দভাণ্ডার ভাষা-সংযোগের স্বাভাবিকতা ও গভীরতা প্রকাশ করে। প্রশাসনিক শব্দভাণ্ডার মুসলিম শাসনব্যবস্থার ভাষিক চিহ্ন বহন করে। নান্দনিক শব্দভাণ্ডার বাংলা কাব্যের অভিব্যক্তির পরিসর প্রসারিত করেছে।

অর্থগত বিবর্তনের দিক থেকে ঋণশব্দগুলো প্রসার ও সংকোচ—উভয় প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গেছে। অর্থপ্রসার ঘটেছে লক্ষ্যভাষায় সংশ্লিষ্ট ধারণার অর্থগত শূন্যতার কারণে; অন্যদিকে, অর্থসংকোচ ঘটেছে দেশীয় শব্দের সঙ্গে প্রতিযোগিতার ফলে। ঋণশব্দের সাহিত্যিক ভূমিকা প্রসঙ্গনির্ভর— ধর্মীয় প্রসঙ্গে এগুলো ধর্মীয় তাৎপর্য বহন করে, আর ধর্মনিরপেক্ষ প্রসঙ্গে নান্দনিক ভূমিকা পালন করে।

সৈয়দ সুলতান ও আলাওলের কাব্য প্রমাণ করে যে ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে আরবি-ফারসি শব্দ বাংলা সাহিত্যে স্বাভাবিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই শব্দগুলো আর বহিরাগত উপাদান ছিল না; সেগুলো বাংলা ভাষার সাহিত্যিক অভিব্যক্তির অপরিহার্য উপকরণে পরিণত হয়েছিল। ভাষা-সংযোগের এই গভীরতা প্রমাণ করে যে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য বহুভাষিক আন্তঃক্রিয়ার এক জটিল ক্ষেত্র, যেখানে আরবি-ফারসি প্রভাব কেন্দ্রীয় মাত্রা হিসেবে বিদ্যমান ছিল।

তৃতীয় পর্ব : ভাষিক সংকরতা, সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান ও সাহিত্যিক তাৎপর্য—

আরবি-ফারসি শব্দভাণ্ডার ও সাহিত্যিক অভিব্যক্তি : মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে আরবি-ফারসি শব্দের সাহিত্যিক ব্যবহার কেবল আভিধানিক প্রয়োজন মেটায়নি; এটি কাব্যিক অভিব্যক্তির নতুন সম্ভাবনা উন্মোচন করেছে। শব্দ যখন ধর্মীয় পরিভাষা থেকে সাহিত্যিক উপকরণে রূপান্তরিত হয়, তখন তার মধ্যে একধরনের দ্বৈততা সৃষ্টি হয়— একদিকে সে মূল ধর্মীয় তাৎপর্য বহন করে, অন্যদিকে কাব্যিক ব্যঞ্জনার বাহক হয়ে ওঠে।

শাহ মুহম্মদ সগীরের কাব্যে এই দ্বৈততার উৎকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়। কবির *ইউসুফ-জুলেখা* কাব্যটি সম্পর্কে আহমদ শরীফ মন্তব্য করেছেন যে, 'পবিত্র কুরআন ও ফিরদৌসীর কাব্য ব্যতীত মুসলিম কিংবদন্তী ও স্বীয় সৃজনী প্রতিভায় নির্ভর করিয়াই সগীর তাহার ইউসুফ-জুলেখা রচনা করিয়াছিলেন'।[২৯] এই মন্তব্য প্রমাণ করে যে সগীরের কাব্য কেবল অনুবাদ নয়; এটি স্বতন্ত্র সৃজনশীলতার ফসল। আরবি-ফারসি উৎসের শব্দগুলো সগীরের কাব্যে স্বাভাবিকভাবে মিশে গেছে এবং চরিত্র ও কাহিনির আবহ নির্মাণে সহায়তা করেছে।

চিত্রকল্প ও প্রতীক : আরবি-ফারসি শব্দ কেবল আভিধানিক একক নয়; এগুলো চিত্রকল্প ও প্রতীকের নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষত ধর্মীয় আখ্যানে আরবি-ফারসি শব্দের প্রতীকী ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

সৈয়দ সুলতানের *নবীবংশ*-এ মহানবীর চরিত্র চিত্রণে ব্যবহৃত ভাষা বিশ্লেষণযোগ্য। কবি লিখেছেন—

"কিঠন পাষাণ দেহ না যায় বিদার।
তাহান বিছেদ আখি নারি সহিবার॥"[৩০]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 49
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 421 - 434
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এখানে 'পাষাণ দেহ' দেশীয় চিত্রকল্প, কিন্তু 'বিরহ' শব্দটি আরবি-ফারসি শব্দভাণ্ডারের সঙ্গে সম্পর্কিত। মহানবীর বিরহ-যন্ত্রণা বর্ণনায় এই আরবি-ফারসি উৎসজাত শব্দ প্রতীকী গভীরতা সৃষ্টি করে। পাষাণ হৃদয়ও যে এই বিরহ সহ্য করতে পারে না— এই চিত্রকল্প ধর্মীয় ভক্তির এক শক্তিশালী অভিব্যক্তি।

ভাষিক সংকরতা : মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের ভাষা মূলত সংকর প্রকৃতির। এই সংকরতায় আরবি, ফারসি, সংস্কৃত, প্রাকৃত ও দেশীয় উপভাষার উপাদান মিলিত হয়েছে। এই ভাষিক সংকরতা কোনো দুর্বলতা নয়; বরং এটি বহুসাংস্কৃতিক বাস্তবতার ভাষিক প্রতিফলন।

শাহ মুহম্মদ সগীরের কাব্যে চট্টগ্রাম অঞ্চলের উপভাষার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এই আঞ্চলিক উপাদান আরবি-ফারসি শব্দের সঙ্গে মিলিত হয়ে এক স্বতন্ত্র ভাষিক সংকরতা সৃষ্টি করেছে।

সৈয়দ সুলতানের কাব্যে এই সংকরতার আরও জটিল রূপ দেখা যায়। তিনি আরবি-ফারসি ধর্মীয় পরিভাষা, দেশীয় দার্শনিক ধারণা এবং আঞ্চলিক ভাষিক বৈশিষ্ট্য— এই তিনটি স্তরকে একই কাব্যে সমন্বিত করেছেন।

মুসলিম-হিন্দু সাংস্কৃতিক আন্তঃক্রিয়া : মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য মুসলিম-হিন্দু সাংস্কৃতিক আন্তঃক্রিয়ার এক জীবন্ত সাক্ষ্য। এই আন্তঃক্রিয়া কেবল সহাবস্থান নয়; এটি সৃজনশীল সমন্বয়ের প্রক্রিয়া।

নবীবংশ-এ ইসলামী নবী-পরম্পরাকে বাংলা ও ভারতীয় সাংস্কৃতিক পরিসরের পরিচিত ধর্মীয়-আখ্যান কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। ফলে গ্রন্থটি শুধু ইসলামী ধর্মীয় বয়ানের অনুবাদ নয়; বরং বাংলা ভাষা ও স্থানীয় সাংস্কৃতিক পরিসরে ইসলামী ইতিহাস ও বিশ্বাসকে পুনর্গঠনের একটি সাহিত্যিক প্রচেষ্টাও বটে।[৩১] এই অসাম্প্রদায়িক মনোভাব মধ্যযুগীয় বাংলার সাংস্কৃতিক সহাবস্থানের এক উজ্জ্বল প্রমাণ।

এই সমন্বয়ের ভাষিক প্রকাশও তাৎপর্যবহ। সুলতান হিন্দু দেবদেবীর নাম দেশীয় রূপে ব্যবহার করেছেন, আবার ইসলামি পয়গম্বরদের নাম আরবি রূপে উপস্থাপন করেছেন। এই নামকরণ-পদ্ধতি তাঁর কাব্যে দুটি ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সহাবস্থান ও পারস্পরিক স্বীকৃতির একটি ভাষিক রূপ প্রকাশ করে।

সাংস্কৃতিক বিনিময় : সাংস্কৃতিক বিনিময় মধ্যযুগীয় বাংলায় একমুখী ছিল না। আরবি-ফারসি শব্দ যেমন বাংলায় প্রবেশ করেছে, তেমনি বাংলার দেশীয় উপাদানও মুসলিম সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। শাহ গরীবুল্লাহর *আমির হামজা*-য় এই দ্বিমুখী সাংস্কৃতিক বিনিময়ের প্রমাণ পাওয়া যায়।[৩২] ফারসি হরফে বাংলা ভাষায় রচিত এই কাব্যে বাংলার লোকজ উপাদান ও দেশীয় ভাষিক বৈশিষ্ট্য সংরক্ষিত হয়েছে।

সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয় ও দর-কষাকষি : সৈয়দ সুলতানের ভাষা-নির্বাচন সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়ের এক ঐতিহাসিক দলিল। তিনি সচেতনভাবে বাংলা ভাষায় কাব্য রচনার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং এই সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেছিলেন—

"আরবী ফারসী ভাষে কিতাব বহুত।
আলিমানে বুঝে ন বুঝে মুখসুত॥
দুঃখ ভাবি মনে মনে করিলুং ঠিক।
রছুলের কথা যথ কহিমু অধিক॥"[৩৩]

এই পদ্যে সুলতান স্বীকার করেছেন যে আরবি-ফারসি ভাষায় প্রচুর গ্রন্থ বিদ্যমান, কিন্তু সাধারণ মানুষ তা বোঝে না। এই স্বীকৃতি থেকে জন্ম নেয় বাংলা ভাষায় ধর্মীয় আখ্যান রচনার প্রয়োজনীয়তা। ভাষা-নির্বাচন তাই কেবল সাহিত্যিক সিদ্ধান্ত নয়; এটি ধর্মীয় জ্ঞানের গণতন্ত্রীকরণের সাংস্কৃতিক প্রকল্প।

ঋণশব্দের রূপান্তর : আরবি-ফারসি শব্দ বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতিতে প্রবেশের পর রূপান্তরের মধ্য দিয়ে গেছে। এই রূপান্তর কেবল ধ্বনিতাত্ত্বিক বা রূপতাত্ত্বিক নয়; এটি সাংস্কৃতিক রূপান্তরও।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 49
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 421 - 434
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

শাহ মুহম্মদ সগীরের *ইউসুফ-জুলেখা* কুরআনিক আখ্যানকে বাংলা প্রণয়োপাখ্যানের কাঠামোয় রূপান্তর করে; ফলে ধর্মীয় আখ্যানের সঙ্গে মানবিক প্রেম, আবেগ ও বাংলা সাহিত্যিক রীতির সমন্বয় ঘটে।[৩৪] এই অনুপস্থিতি তাৎপর্যবহ: সগীরের প্রেম-চিত্রায়ণ দেশীয় রসতত্ত্বের ভিত্তির ওপর গড়ে উঠেছে, আরবি-ফারসি প্রেম-দর্শনের ওপর নয়।

তুলনামূলক পাঠ্য বিশ্লেষণ : শাহ মুহম্মদ সগীর ও সৈয়দ সুলতানের কাব্যের তুলনামূলক পাঠ আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহারে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য প্রকাশ করে।

সগীরের *ইউসুফ-জুলেখা* মূলত প্রণয়-কাব্য। এখানে আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার প্রধানত নাম ও স্থান-নির্দেশে সীমাবদ্ধ। 'ইউসুফ', 'জুলেখা', 'মিসর', 'আজিজ' প্রভৃতি শব্দ ধর্মীয় আখ্যানের পরিচয়বাহক, কিন্তু কাব্যের মূল আবেগ দেশীয় প্রেম-ভাষায় প্রকাশিত।

অন্যদিকে সৈয়দ সুলতানের *নবীবংশ* মূলত ধর্মীয় জীবনী। এখানে আরবি-ফারসি ধর্মীয় পরিভাষার ঘন ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। সুলতান নিজেই বলেছেন—

"এই সব পরস্তাব কুরআনে আছিল।
দেশী ভাষা করি তারে পণ্ডিতি রচিলু॥"[৩৫]

এই পদ্যে 'কুরআন' আরবি শব্দ এবং 'দেশী ভাষা' দেশীয় অভিব্যক্তির বাহন। কবি সচেতনভাবে আরবি ধর্মীয় গ্রন্থের বিষয়বস্তু বাংলা ভাষায় রূপান্তরের ঘোষণা দিয়েছেন। এই ঘোষণা ভাষা-অনুবাদের সাংস্কৃতিক তাৎপর্যকে সামনে আনে।

ভাষিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য : মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে আরবি-ফারসি শব্দের উপস্থিতি একাধিক স্তরে তাৎপর্যবহ। ভাষিক স্তরে, এই শব্দগুলো বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেছে এবং নতুন অভিব্যক্তির সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে। ধর্মীয়, প্রশাসনিক, সামাজিক ও নান্দনিক— সবক্ষেত্রেই আরবি-ফারসি উপাদান বাংলা ভাষার অভিব্যক্তি-পরিসর প্রসারিত করেছে।

সাংস্কৃতিক স্তরে, এই শব্দগুলোর উপস্থিতি মুসলিম-হিন্দু সহাবস্থান ও সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের সাক্ষ্য বহন করে। সৈয়দ সুলতানের কাব্যে ইসলামি ও হিন্দু ঐতিহ্যের সমান্তরাল উপস্থাপনা এই সমন্বয়ের উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

সাহিত্যিক স্তরে, আরবি-ফারসি শব্দ কাব্যিক চিত্রকল্প, প্রতীক ও রস-নির্মাণে ভূমিকা রেখেছে। ভাষিক সংকরতা মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের এক স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে।

মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্যের নিবিড় পাঠ : সৈয়দ সুলতানের *নবীবংশ*-এর একটি অংশে কবি শেখ নসিয়ত বর্ণনা করেছেন—

"এবং শুন যেক্ষপ জিন্মব মুহম্মদ।
শুনিলে সে সব কথা খণ্ডি আপদ॥"[৩৬]

এখানে 'মুহম্মদ' আরবি নাম, আর 'আপদ' দেশীয় শব্দ। এই পদ্যে আরবি-ফারসি ও দেশীয় উপাদানের সহাবস্থান ভাষিক সংকরতার একটি ক্ষুদ্র প্রতিরূপ। 'জিন্মব' শব্দটি সম্ভবত 'জন্ম' বা 'জিনিস'-এর কোনো আঞ্চলিক রূপ, যা আঞ্চলিক ভাষিক বৈচিত্র্যের সাক্ষ্য বহন করে।

আরেকটি অংশে সৈয়দ সুলতান তাঁর সমকালীন যুগের নৈতিক অবক্ষয় বর্ণনা করেছেন—

"গ্রামী যথ ডাকিয়া কহিলা দুরাচার।
লাগিলে ত এক এক শাস্ত্র শিখাইবার॥"[৩৭]

এখানে 'দুরাচার' সংস্কৃত-উদ্ভূত শব্দ, কিন্তু এর সঙ্গে যুক্ত বাক্যগঠন দেশীয়। এই ভাষিক মিশ্রণ প্রমাণ করে যে মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্যের ভাষা কেবল আরবি-ফারসি উপাদাননির্ভর নয়; বরং এতে সংস্কৃত ও দেশীয় উপাদানেরও সমন্বয় ঘটেছে।

অনুসন্ধানের সংশ্লেষণ : এই গবেষণার অনুসন্ধান আরবি-ফারসি উৎস থেকে বাংলা অভিযোজন, আর্থিক বিকাশ, সাহিত্যিক প্রয়োগ এবং সাংস্কৃতিক তাৎপর্য— এই পাঁচ স্তরের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে।

প্রথম স্তরে, আরবি-ফারসি শব্দের উৎস শনাক্তকরণ প্রমাণ করে যে এই শব্দগুলো বহুস্তরীয় যাত্রাপথ অতিক্রম করেছে। আরবি থেকে ফারসি, thence বাংলা— এই প্রক্রিয়া কেবল ভাষিক নয়; এটি সাংস্কৃতিক বিনিময়ের পথও।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 49
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 421 - 434
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

দ্বিতীয় স্তরে, বাংলা অভিযোজন ধ্বনিতাত্ত্বিক, লিপিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক— তিনটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়েছে। এই অভিযোজন প্রমাণ করে যে বাংলা ভাষা ঋণশব্দ গ্রহণে নিষ্ক্রিয় ছিল না; বরং সক্রিয়ভাবে তাদের নিজস্ব নিয়মে রূপান্তরিত করেছে।

তৃতীয় স্তরে, আর্থিক বিকাশ প্রসার ও সংকোচ— উভয় প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ঘটেছে। এই বিকাশ প্রমাণ করে যে ঋণশব্দের অর্থ স্থিতিশীল নয়; লক্ষ্য-ভাষার প্রয়োজন অথবা, দেশীয় শব্দের সঙ্গে প্রতিযোগিতা তাদের অর্থ-পরিসর নির্ধারণে ভূমিকা রাখে।

চতুর্থ স্তরে, সাহিত্যিক প্রয়োগ প্রমাণ করে যে আরবি-ফারসি শব্দ কেবল আভিধানিক উপকরণ নয়; এগুলো চিত্রকল্প, প্রতীক ও রস-নির্মাণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

পঞ্চম স্তরে, সাংস্কৃতিক তাৎপর্য প্রমাণ করে যে এই শব্দগুলোর উপস্থিতি মুসলিম-হিন্দু সহাবস্থান, সাংস্কৃতিক সমন্বয় ও ভাষা-আত্মপরিচয়ের জটিল প্রক্রিয়ার সাক্ষ্য।

গবেষণা প্রশ্নের উত্তর : প্রথম গবেষণা প্রশ্নের উত্তর হল - আরবি-ফারসি শব্দের অনুপ্রবেশ ধর্মীয়, প্রশাসনিক, সাংস্কৃতিক ও দৈনন্দিন— এই চারটি প্রধান কারণের সমন্বিত ফল। সর্বাধিক প্রতিনিধিত্ব লাভ করেছে ধর্মীয় শব্দভাণ্ডার, কারণ ইসলাম ধর্মের প্রসারই ছিল ভাষা-সংযোগের প্রধান চালিকাশক্তি।

দ্বিতীয় গবেষণা প্রশ্নের উত্তর হল - আরবি-ফারসি শব্দ কেবল আভিধানিক স্তরে সীমাবদ্ধ ছিল না; তারা সাহিত্যিক রূপক, উপমা ও চিত্রকল্পের নির্মাণেও ভূমিকা রেখেছে। শাহ মুহম্মদ সগীরের কাব্যে 'কামান' শব্দের অলংকারিক ব্যবহার এই সত্যের প্রমাণ।

তৃতীয় গবেষণা প্রশ্নের উত্তর হল - মুসলিম কবিদের কাব্যে আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার ব্যাপক, যেখানে হিন্দু কবিদের কাব্যে তা সীমিত। এই পার্থক্যের স্বরূপ ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ভিন্নতার মধ্যে নিহিত।

চতুর্থ গবেষণা প্রশ্নের উত্তর হল - ফারসি হরফে বাংলা কাব্য ভাষা-লিপি সম্পর্কের এক স্বতন্ত্র জটিলতা প্রকাশ করে। এই জটিলতা প্রমাণ করে যে ভাষা ও লিপি সর্বদা অভিন্ন নয়; তারা স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক প্রকল্প।

গবেষণার শূন্যতা পূরণ : এই গবেষণা বিদ্যমান শূন্যতার কয়েকটি দিক পূরণ করেছে। প্রথমত, এটি আরবি-ফারসি শব্দের ভাষাতাত্ত্বিক শ্রেণিবিন্যাস তৈরি করেছে, যা পূর্ববর্তী গবেষণায় অনুপস্থিত ছিল। দ্বিতীয়ত, এটি সাহিত্যিক প্রয়োগের বিশ্লেষণে গভীরতা যোগ করেছে। তৃতীয়ত, এটি পুঁথি সাহিত্যের ভাষা-লিপি জটিলতার পদ্ধতিগত পাঠ উপস্থাপন করেছে।

উপসংহার : এই গবেষণায় মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার ও তাৎপর্যকে ভাষাতাত্ত্বিক, সাহিত্যিক এবং সাংস্কৃতিক— এই তিনটি আন্তঃসম্পর্কিত দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণার ফলাফল স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, আরবি-ফারসি শব্দের বাংলায় প্রবেশকে কেবল বিদেশি শব্দের আভিধানিক সংযোজন হিসেবে ব্যাখ্যা করা যথেষ্ট নয়; বরং এটি দীর্ঘস্থায়ী ভাষা-সংযোগ, সাংস্কৃতিক বিনিময় এবং সৃজনশীল অভিযোজনের একটি বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া। এসব শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশের পর ধ্বনিতাত্ত্বিক, লিপিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষার নিজস্ব গঠন ও ব্যবহারিক নিয়মের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। একই সঙ্গে অর্থের প্রসার, সংকোচ ও পুনর্নির্মাণের ফলে অনেক শব্দ নতুন অর্থ-পরিসর অর্জন করেছে। ফলে একসময়ের বহিরাগত শব্দসমষ্টি ক্রমে বাংলা ভাষার স্বাভাবিক ও কার্যকর শব্দসম্পদের অংশে পরিণত হয়েছে।

সাহিত্যিক বিশ্লেষণ থেকে আরও প্রতীয়মান হয় যে, আরবি-ফারসি শব্দের ভূমিকা কেবল বিষয়বস্তু বা ধর্মীয় ধারণা প্রকাশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। শাহ মুহম্মদ সগীর, সৈয়দ সুলতান ও আলাওলের রচনায় এসব শব্দ কাব্যিক চিত্রকল্প, প্রতীক, আবেগ, ভাবব্যঞ্জনা এবং নান্দনিক প্রকাশকে সমৃদ্ধ করেছে। বিশেষত সৈয়দ সুলতানের *নবীবংশ*-এ ইসলামি ও দেশীয় সাংস্কৃতিক উপাদানের পারস্পরিক উপস্থিতি মধ্যযুগীয় বাংলায় সাংস্কৃতিক সমন্বয় ও আন্তঃসম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 49
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 421 - 434
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এই গবেষণার প্রধান একাডেমিক অবদান হল মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে আরবি-ফারসি উপাদানকে বিচ্ছিন্ন ভাষিক আমদানি হিসেবে নয়, বরং বাংলা ভাষার বহুভাষিক বিকাশ, সাহিত্যিক সৃজনশীলতা এবং সাংস্কৃতিক রূপান্তরের সক্রিয় উপাদান হিসেবে পুনর্বিবেচনা করা। এই দৃষ্টিভঙ্গি বাংলা ভাষার ইতিহাসকে একরৈখিক ও একক উৎসনির্ভর বিবরণের পরিবর্তে আন্তঃভাষিক ও আন্তঃসাংস্কৃতিক মিথস্ক্রিয়ার গতিশীল প্রক্রিয়া হিসেবে অনুধাবনের সুযোগ সৃষ্টি করে। অতএব, আরবি-ফারসি শব্দের অধ্যয়ন মধ্যযুগীয় বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সমাজের বহুত্ববাদী ঐতিহ্য পুনর্মূল্যায়নের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সম্ভাবনাময় গবেষণাক্ষেত্র।

Reference:

১. চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, দ্য অরিজিন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অব দ্য বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ (কলকাতা: ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯২৬), পৃ. ২১১

২. সৈয়দ আলী আশরাফ, মুসলিম ট্র্যাডিশনস ইন বেঙ্গলি লিটারেচার (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৬৪), পৃ. ১১২

৩. আহমদ শরীফ, বাঙ্গালী ও বাংলা সাহিত্য, ২য় খণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৩), পৃ. ২৩৬

৪. মুহম্মদ এনামুল হক, মুসলিম বাংলা সাহিত্য (করাচি: পাকিস্তান পাবলিকেশন্স, ১৯৫৭), পৃ. ৪৫

৫. আয়েশা এ. ইরানি, দ্য মুহাম্মদ অবতারা: সালভেশন হিস্টোরি, ট্রান্সলেশন, অ্যান্ড দ্য মেকিং অব বেঙ্গলি ইসলাম (নিউ ইয়র্ক: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০২১), পৃ. ৭০–১১৩

৬. তানিমা দে, “মেকিং অব ইসলাম ইন মিডিয়েভ্যাল বেঙ্গল: ইন লাইট অব ইউসুফ-জুলেখা অ্যান্ড রাসুল বিজয়,” জার্নাল অব দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ (হিউম্যানিটিজ), ৬৬, নং ১ (২০২১), পৃ. ২৫

৭. সৈয়দ আলী আশরাফ, মুসলিম ট্র্যাডিশনস ইন বেঙ্গলি লিটারেচার (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৩), পৃ.৩

৮. সৈয়দ সুলতান, নবীবংশ, উদ্ধৃত: আহমদ শরীফ, আহমদ শরীফ রচনাবলী, ৫ম খণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৫), পৃ. ২৩৬

৯. আয়েশা এ. ইরানি, “ইনটু দ্য ইঙ্কি ফ্রে: আ প্রিমডার্ন পীর-পোয়েট অ্যান্ড দ্য পলিটিক্স অব বাংলাদেশ’স রিজিওনাল স্কলারশিপ,” জার্নাল অব দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ (হিউম্যানিটিজ), ৬৪, নং ১ (২০১৯): পৃ. ১০৭

১০. চট্টোপাধ্যায়, দ্য অরিজিন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অব দ্য বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ, পৃ. ২১১

১১. তদেব, পৃ. ২১৪–২১৫

১২. ইরানি, দ্য মুহাম্মদ অবতারা, পৃ. ৮৩–৮৪

১৩. আলাওল, পদ্মাবতী, আলাওল রচনাবলী (২০০৭), পৃ. ২৭

১৪. সুলতান, নবীবংশ, পৃ. ২৩৬

১৫. শরীফ, মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ, পৃ. ৭৮

১৬. সুলতান, নবীবংশ, পৃ. ২৩৬

১৭. তদেব, পৃ. ২৩৬

১৮. এনামুল হক, মুসলিম বাংলা সাহিত্য, পৃ. ৪৫

১৯. কাজী রফিকুল ইসলাম, “বাংলা ভাষায় আরবি-ফারসি-তুর্কি-হিন্দি (উর্দু) শব্দের অভিধান (দ্বিতীয়াংশ),” সাহিত্য পত্রিকা, ৪৪, নং ১ (২০০০): পৃ. ১০৩

২০. তদেব, পৃ. ১০৩

২১. শরীফ, মধ্যযুগের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ৯৫

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 49
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 421 - 434
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

২২. তদেব, পৃ. ৯৫
২৩. সুলতান, নবীবংশ, পৃ. ২৩৬
২৪. চট্টোপাধ্যায়, দ্য অরিজিন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অব দ্য বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ, পৃ. ২১১
২৫. আলাওল, পদ্মাবতী, আলাওল রচনাবলী, পৃ. ২৭
২৬. আশরাফ, মুসলিম ট্র্যাডিশনস ইন বেঙ্গলি লিটারেচার, পৃ. ১১২
২৭. সুলতান, নবীবংশ, পৃ. ২৩৬
২৮. তদেব, পৃ. ২৩৬
২৯. শরীফ, মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ, পৃ. ৭৮
৩০. সুলতান, নবীবংশ, পৃ. ২৩৬
৩১. ইরানি, দ্য মুহাম্মদ অবতারা, পৃ. ১৭২–১৯৬
৩২. শরীফ, বাঙ্গালী ও বাংলা সাহিত্য, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২১
৩৩. সুলতান, নবীবংশ, পৃ. ২৩৬
৩৪. দে, "মেকিং অব ইসলাম ইন মিডিয়েভ্যাল বেঙ্গল," পৃ. ২৫
৩৫. সুলতান, নবীবংশ, পৃ. ২৩৬
৩৬. তদেব, পৃ. ২৩৬
৩৭. তদেব, পৃ. ২৩৬

Bibliography:

আলাওল, পদ্মাবতী, সম্পাদনা করেছেন শ্রী রামানন্দ সংঘ, ১৯৩১
আশরাফ, সৈয়দ আলী, মুসলিম ট্র্যাডিশনস ইন বেঙ্গলি লিটারেচার, বাংলা একাডেমি, ১৯৬৪
চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, দ্য অরিজিন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অব দ্য বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ, Calcutta University Press, ১৯২৬
দে, তানিমা। "Making of Islam in Medieval Bengal: In Light of Yusuf-Zulekha and Rasul Bijoy." Journal of the Asiatic Society of Bangladesh (Humanities), vol. 66, no. 1, ২০২১, pp. ২৫–৪২
এনামুল হক, মুহম্মদ। মুসলিম বাংলা সাহিত্য। পাকিস্তান পাবলিকেশন্স, ১৯৫৭
ইরানি, আয়েশা এ. The Muhammad Avatara: Salvation History, Translation, and the Making of Bengali Islam. Oxford University Press, ২০২১
ইরানি, আয়েশা এ. 'ইনটু দ্য ইঙ্কি ফ্রেই : আ প্রিমডার্ন পীর-পোয়েট অ্যান্ড দ্য পলিটিক্স অব বাংলাদেশ'স রিজিওনাল স্কলারশিপ।' জার্নাল অব দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ (হিউম্যানিটিজ), vol. 64, no. 1, ২০১৯, pp. ১০৭–১৪৬
ইসলাম, কাজী রফিকুল, 'বাংলা ভাষায় আরবি-ফারসি-তুর্কি-হিন্দি (উর্দু) শব্দের অভিধান (দ্বিতীয়াংশ)।' সাহিত্য পত্রিকা, vol. 44, no. 1, ২০০০, pp. ১০৩–১৭২
শরীফ, আহমদ, আহমদ শরীফ রচনাবলী, খণ্ড ৫, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৫
শরীফ, আহমদ, বাঙ্গালী ও বাংলা সাহিত্য, খণ্ড ২, বাংলা একাডেমি, ১৯৮৩
শরীফ, আহমদ, মধ্যযুগের কাব্য সংগ্রহ, বাংলা একাডেমি, ১৯৬৩
শরীফ, আহমদ, মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ। মুক্তধারা, ১৯৭৭